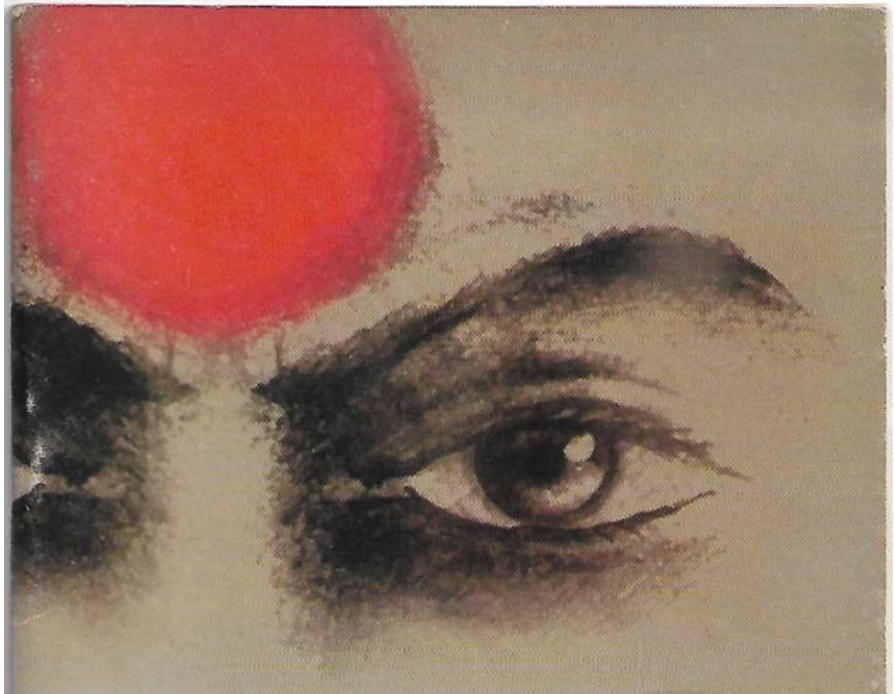

আজকের যুক্তিবাদ কি ও কেন?

প্রবীর ঘোষ

'সমকালীন যুক্তিবাদ' চির নতুন

'সমকালীন যুক্তিবাদ' (Contemporary Rationalism) একটি বিশ্ব-নিরীক্ষণপদ্ধতি, একটি সম্পূর্ণ দর্শন ও একটি সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নাম।

'সমকালীন যুক্তিবাদ' যখন ছিল না, তখনও যুক্তি ছিল, যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া ছিল, যুক্তিকে 'দর্শন' হিসেবে দাঁড় করাবার প্রয়াসও ছিল। স্থান ও কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জগতকে দেখার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পালটায়। পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি, পুরনো মতাদর্শ, মূল্যবোধকে ত্যাগ করার একটা বড়ো বাধা প্রাচীনপন্থী সমাজ। চিন্তায় এগিয়ে থাকা মানুষই পারে যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে ভালোকে গ্রহণ করতে ও খারাপকে ফেলে দিতে। এই যে চিন্তার সঙ্গে নিজের জীবনে তার প্রয়োগের মেলবন্ধন এটাই সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সমাজ ততটাই এগোয় যতটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই।

সমাজ-প্রগতির অর্থ সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণির প্রগতি হতে পারে না। শোষণের অবসান ছাড়া সারা সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। ধনী-গরীব থাকলে শোষণ থাকবে। সমাজ-প্রগতির স্বার্থে, মানব প্রজাতির প্রগতির স্বার্থে যুক্তিবাদীরা শোষণের অবসান চায়। শুধু চাইলে তো হবে না, চাওয়াটাকে সফল করে তোলাটাই বড়ো কথা। যতক্ষণ আপনি শুধু চাইছেন, ততক্ষণ ধনীদের এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আপনি সার্থক প্রয়োগের চেষ্টা করলে সংঘর্ষ অনিবার্য।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধনীরা নিত্য-নতুন কৌশল নিচ্ছে গরিবদের পায়ের তলায় রাখতে। পুঁজিবাদীদের কৌশলের সঙ্গে সার্থক মোকাবিলা করতে হলে যুক্তিবাদীদেরও নতুন নতুন কৌশল বের করতেই হবে। পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদকেও নতুনভাবে সাজাতে হবে। পালটাতে হবে। যুক্তিবাদকে স্থবির করে রাখলে তা হবে যুক্তিবাদেরই মৃত্যু।

'যুক্তিবাদ' হঠাৎ করে আকাশ থেকে এসে পড়েনি। এই মতবাদের পরিপূর্ণ দর্শন হয়ে ওঠার একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বুদ্ধ, মহাবীর,চার্বাক থেকে দেকার্ত, স্পিনোজা, হেগেল, কান্ট, মার্কস, লেনিন, মাও— প্রত্যেকেরই অবদানের পরিণতিতে আজ 'যুক্তিবাদ' একটা সম্পূর্ণ

দর্শনের রূপ পেয়েছে। 'যুক্তিবাদ' ও 'নব্য -যুক্তিবাদ'-এর পথ পরিক্রমা শেষে 'সমকালীন যুক্তিবাদ' চিরকালই সমকালীন থাকবে-এমনই এক যুক্তিবাদ।

আমরা আগে যা আলোচনা করেছি, পরে যা আলোচনা করব, তাতে আশা করি যুক্তিবাদের ইতিহাস ও আধুনিক যুক্তিবাদের স্বরূপ কিছুটা স্পষ্ট হবে।

যুক্তিবাদ ও যুক্তিবাদী সমিতি

'যুক্তিবাদ'কে সম্পূর্ণ দর্শন হিসেবে গড়ে তুলতে 'সমকালীন যুক্তিবাদ', চির আধুনিক যুক্তিবাদকে সম্পূর্ণ একটা রূপ দিতে এবং 'যুক্তিবাদী আন্দোলন'কে সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে প্রয়োগ করার চিন্তা থেকে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র জন্ম। জন্মের সময় ১মার্চ ১৯৮৫।সে সময় অবশ্য নাম ছিল 'ভারতের যুক্তিবাদী সমিতি'লোকে সংক্ষেপে 'যুক্তিবাদী সমিতি' বলে।

যুক্তিবাদী সমিতি গড়ে তোলার আগে ছিল একটা প্রস্তুতি-পর্ব। সে সময়কার জনপ্রিয় বাংলা সাপ্তাহিক ছিল 'পরিবর্তন'। কয়েক বছর ধরে পরিবর্তনে 'লৌকিক, অলৌকিক শিরোনামে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরিবর্তনে ব্যাপক প্রচারের কল্যাণে আমার লেখাগুলো বেশ কিছুসংখ্যক পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরার সুযোগ পাই। সেসব লেখাকে ভালোবাসার মানুষ পেয়েছিলাম প্রচুর। লেখার মূল সুরের সঙ্গে সহমত মানুষ দের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলি। গ্রামে-গঞ্জে- শহরে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করা শুরু করি। এক সময় মনে হল, এবার সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার সময় হয়েছে। তারপর এল ১ মার্চ ১৯৮৫।

সমিতির একটা উদ্দেশ্যসূচি বা Mainfesto র প্রয়োজন আমরা অনুভব করলাম। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই লেখা হল 'সংস্কৃতি ঃ সংঘর্ষ ও নিমার্ণ' গ্রন্থটি। প্রকাশিত হল '৯৩ এর ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বইমেলায়। গ্রন্থটিতে একই সঙ্গে দুটি বিষয়কে স্পষ্ট করা হল। ১) যুক্তিবাদ একটি সম্পূর্ণ দর্শন। (২) যুক্তিবাদ একটি সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী, সাম্যের স্বপ্ন দেখা রাজনীতিক

এবং চিন্তাবিদদের অনেকের কাছেই গ্রন্থটি অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেল। দেখা গেল, একটা বই বাম রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে স্পষ্ট polarization আনল। অর্থাৎ বইটা এইসব রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃত্বকে সরাসরি দুই শিবিরে বিভক্ত করল। একদল গ্রন্থটির বক্তব্যের পক্ষে, একদল বিপক্ষে।

বি.বি. সি.-র প্রোডিউসর-ইন-চার্জ রবার্ট ঈগ্‌ল ভারতে এলেন ১৯৯৪ -এ। উদ্দেশ্য ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলনের উপর এক ঘন্টার একটা ডকুমেন্টরি তৈরি করা।

'গুরু বাস্টার্স' নামের তথ্যচিত্রটির শেষ অংশে বিশেষজ্ঞের মতামতে বিশিষ্ট সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত জানালেন — ভারতের বাম রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই সরাসরি বিভাজন আছে, প্রবীর ঘোষের পক্ষে অথবা বিপক্ষে। ভারতের রাজনীতিতে প্রবীর ঘোষ এবং 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' একটা 'ফ্যাক্টর'।

তথচিত্রটির বক্তব্য শুনে ও গোয়েন্দা দফতরের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রশক্তি যথেষ্ট শঙ্কিত হল। যুক্তিবাদী আন্দোলন ধ্বংস করতে দালালদের অনুপ্রবেশ ঘটাল যুক্তিবাদী সমিতিতে। নকশাল ধ্বংসের জন্য যেসব কৌশল রাষ্ট্র গ্রহণ করেছিল, তার একটা ছিল, নকশালদেব মধ্যে নিজেদের ইনফরমার বা দালাল ঢুকিয়ে দেওয়া।

সমগ্র যুক্তিবাদী সমিতি ও তার শাখা হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনকে সরকারি ও বেসরকারি অর্থসাহায্যপুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় রূপান্তরের পরিকল্পনা নিল রাষ্ট্র। পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রকে সার্থক করতে নেমে পড়ল অনুপ্রবেশকারী দালালরা।

রাষ্ট্রের সহায়ক শক্তি এবং জ্যোতিষী, অলৌকিক বাবাজি-মাতাজিরা দালালদের ক্ষমতা দখলের কাজে পূর্ণ সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিল।

এত করেও রাষ্ট্র যুক্তিবাদী আন্দোলনেক শেষ করতে পারেনি। দালালরা পারেনি সমিতি দখল নিতে, সমিতিকে তৃণভোজী বানাতে।

যুক্তিবাদীরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছুই শিখেছিল। শিখেছিল 'মস্তিষ্ক যুদ্ধ'-এর পালটা 'মস্তিষ্ক যুদ্ধ' প্রয়োগ করতে। শিখেছিল—মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতার অর্থ ধ্বংস। শিখেছিল লড়াইতে জনগণকে কাছে টানতে। ফলে যুক্তিবাদী আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছে সাধারণ থেকে অসাধারণ মানুষদের। তাঁরই ছিলেন এই ভাঙার চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তিবাদী সমিতির সহায়ক শক্তি। তাই আগুন থেকে ফিনিক্স পাখির মত উঠে এসে আবারও ডানা মেলেছে যুক্তিবাদী আন্দোলন।

দীর্ঘকাল ধরেই বিভিন্ন দার্শনিক 'দর্শন' বা সামগ্রিকভাবে বিশ্বকে দেখার প্রজ্ঞা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সমাজের হিত নিধারণ ও তার প্রয়োগ নিয়ে মাথা ঘামাননি। এখানেই প্রয়োজনের ছিল এক মানবতাবাদী নীতিশাস্ত্রের। তাই সমকালীন যুক্তিবাদের প্রয়োজনে ১৯৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর জন্ম নিল 'হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া।'। তারপর ঐতিহাসিক জয় এনেছে 'হিউম্যানিস্টস' অ্যাসোসিয়েশন।

১০ অক্টোবর ১৯৯৩ একটি ঐতিহাসিক দিন। এদিন 'Religion' কলামে 'মানবতাবাদী' লেখার আইনি অধিকার এনে দিল অ্যাসোসিয়েশন। ১৯৯৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফর্ম' থেকে 'Religion' কলাম বিদায় নিল।

১৯৯৯-এর ১০ ডিসেম্বর প্রকাশিত হল একটি বই, 'কাশ্মীর সমস্যা ঃ একটি ঐতিহাসিক দলিল।' প্রকাশক হিউম্যানিস্টস' অ্যাসোসিয়েশন। দলিলটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপত্রে, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তা প্রকাশিত হল। এরপর কাশ্মীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের মতবাদই গেল পালটে।

দেহ-ব্যাবসাকে আইনি করার একটা চক্রান্ত চলছিল গত কয়েক বছর ধরে। ২০০০ সালের আগস্টে বিলটা সংসদে ওঠার কথা ছিল। প্রচারের বদলে পালটা প্রচারে নামতে হয়েছিল। টিভি-তে বেশ কিছু এপিসোডে 'হিউম্যানিস্টস' অ্যাসোসিয়েশন এই চক্রান্তের স্বরূপ বে-আব্রু করেছে। সঙ্গে পেয়েছে বহু লেখক-সাংবাদিক-সমাজবিজ্ঞানীসহ অনেক বিশিষ্ট এবং বিভিন্ন রাজনীতিককে। ফলে শেষ পর্যন্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।

এমনই প্রায় অসম্ভব জয়ের তালিকা বড়-ই দীর্ঘ।

ভারতের এক সময়ের মূল চিন্তাধারা কি শুকিয়ে যাচ্ছে?

ভারতীয় দর্শনের মূল চিন্তাধারা বা আদি চিন্তাধারা ছিল নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী। সেই নিরীশ্বরবাদী চিন্তার ঐতিহ্যের সূত্র ধরে 'সমকালীন যুক্তিবাদ'-এর উৎপত্তি এই ভারতেই। 'সমকালীন যুক্তিবাদ' নস্তিক্যবাদ বা নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে বাড়তি কিছু।

সমকালীন যুক্তিবাদীরা মনে করেন না যে, একজন মানুষ নাস্তিক হলেই সে সুন্দর এক সাম্যের সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আদর্শ ভূমিকা পালন করবে। মানবিক গুণের আধার হবে।

নাস্তিক যদি স্বার্থপর ও অসৎ হয়, সে সমাজকে শুধু বিষই দিতে পারে। একজন নাস্তিক মানবিক গুণে ঋদ্ধ হলে তিনি আমাদের উদ্দীপ্ত করেন, আদর্শ হয়ে ওঠেন।

ঈশ্বর, অলৌকিকতা, নিয়তি, জন্মান্তর, কর্মফল, মন্ত্র-তন্ত্র, তাগা-তাবিজ ইত্যাদি কুসংস্কারের ঊর্দ্ধে থাকাটা 'যুক্তিবাদী' হওয়ার পূর্বশর্ত। কিন্তু শেষ কথা নয়। শেষ কথাটি হল—অবশ্যই তাকে মানবতাবাদী হতে হবে। অর্থাৎ 'মানবতাবাদী' ' হয়ে ওঠার পূবশর্ত, যুক্তিবাদী হতে হবে। আমরা বোধ হয় বলতে পারি, 'যুক্তিবাদ' ও 'মানবতাবাদ' পরিপূরক একটা মতবাদ।

একটা সময়, সময়টা ধরুন আড়াই হাজার বছর আগেব। সেই সময় থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা (intellect) এবং আমাদের বুদ্ধি (reason) আমাদের মতামত (opinion) তৈরিতে সাহায্য করেছে। যতই সময় এগিয়েছে ততই আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা থেকে ঋদ্ধ হয়েছি। এভাবেই মানুষ শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-ক্রীড়া-বিজ্ঞান প্রতিটি বিভাগে এগিয়ে চলেছে। যে জয় গোস্বামীর অক্ষর জ্ঞানের শুরু হয়েছিল বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় দিয়ে, তারপর তিনি মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পড়ে প্রতিনিয়ত পরিশীলিত হতে হতে আজকের শক্তিমান কবি জয় গোস্বামী হয়েছেন। তিনি যদি দু'শ বছর আগে জন্মাতেন, তবে তাঁর কবিতা দু'শ বছর পিছিয়েই থাকত। এটাই নিয়ম।

তবে সবাই পূর্বসূরীদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজের জ্ঞানকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধ প্রমুখ চিন্তাবিদেরা যে যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, আড়াই হাজার বছর পরেও এদেশের বহু আই. এ. এস., অধ্যাপক, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ বুদ্ধের যুক্তি-বুদ্ধিকে আত্মস্থ করতে পারেননি। তাঁরা মানসিকভাবে পড়ে আছেন আদিম সমাজের ম্যাজিক বিলিফের সময়ে।

বুদ্ধ কোনও গ্রন্থকেই স্বতঃপ্রমাণ, চিরসত্য বা absolute বলে মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন, আজকের জানা ও ভবিষ্যতের জানা এক নাও হতে পারে; কারণ পূর্ব অভিজ্ঞাতা জ্ঞানকে আরও পরিণত করে।

লেনিন লিখেছেন, "মার্কসের তত্ত্বকে আমরা সম্পূর্ণকৃত ও অলঙ্ঘনীয় একটা কিছু বলে মনে করি না;

বরঞ্চ আমরা প্রত্যয়শীল যে তা সেই বিজ্ঞানটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছে সমাজতন্ত্রীদের যাকে অবশ্যই সকল দিকে বিকশিত করতে হবে, যদি তারা জীবনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চায়।" (V.I. Lenin, Our program, Collected Works, Vol-4, Progress Publishers, Moscow, Page 211)

যাঁরা মনে করেন মার্কসবাদ কার্ল মার্কসের কোনও পূর্ব-অভিজ্ঞাতা লব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ নয়, মার্কসের চিন্তায় হঠাৎ করেই এমন মতবাদের উদ্ভব—তাঁরা আর যাই হোন, মার্কসবাদী বা যুক্তিবাদী নন।

কার্ল মার্কসও তাঁর মতামতে পৌঁছাবার আগে ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন উপাসনা-ধর্মের উদ্ভব ও বিবর্তন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার যুক্তিবোধকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অবস্থাকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং একটি সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছেন।

মার্কস তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা বা অর্জিত জ্ঞানকে আত্মস্থকরণের পর যুক্তির পথ ধরেই তাঁর মতামতে (যা মার্কসবাদ নামে পরিচিত) পৌঁছেছিলেন।

কিছু মার্কসপূজারী এই বলে গর্ব অনুভব করেন যে, মার্কসবাদেরই অংশ যুক্তিবাদ। অর্থাৎ সমস্ত রকম যুক্তিকে তুচ্ছ করে, পাত্তা না দিয়ে

মার্কস হঠাৎ করে তাঁর মতামতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর মার্কস এলেন, তাই প্রকৃতির নিয়মে যুক্তি দেখা দিল। যেন মার্কসের আগে মেঘ ছাড়াই বৃষ্টি হত।

কারও কারও মনে হতে পারে মার্কসবাদীদের ভক্তিবাদে গা ভাসানো নিয়ে আলোচনা যেন—ধান ভানতে শিবের গান। আমার কিন্তু মনে হয়নি। আমার মনে হয়েছিল মার্কসবাদীরা ভক্তিরসে আপ্লুত হলে যুক্তিবাদ বড়ো রকমের ধাক্কা খাবেই। কারণ হিসেবে আবারও বলি ভক্তির আবেগ বা ভক্তিবাদ যুক্তিবাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। আর, যুক্তিমনস্কতা মার্কসবাদের পূর্ব শর্ত।

যুক্তিবাদী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকারীরাই বিপ্লবের অগ্রবাহিনী। এরাই তো মানুষের চেতনায় ঢুকে থাকা কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কারের দায়িত্ব নেবে। এরাই আন্তরিকাতার সঙ্গে বঞ্চিত মানুষদের সত্যিকে বোঝাবে। মানুষ বুঝবে, তার বঞ্চনার কারণ ভাগ্য, পূর্বজন্মের কর্মফল বা ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া না পাওয়া নয়। দায়ী সমাজের এই কাঠামো। বোঝাতে হবে গণতন্ত্রের আসল চেহারা। এই সমাজ কাঠামোয় নির্বাচনে জিতে কেন্দ্রের বা রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা দখল করতে হয়। নির্বাচনে জিততে যে বিপুল পরিমাণ টাকার দরকার হয়, তার প্রায় পুরোটাই তোলা হয় ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। শিল্পপতি ধনীরা সেই সব রাজনৈতিক দলকেই টাকা দেয়, সাদের নির্বাচনে জেতার মতো দলীয় পরিকাঠামো আছে। সৎ হলেই নির্বাচনে জেতা যায় না। প্রতিটি নির্বাচনকেন্দ্রে এজেন্ট দিতে হয়। নির্বাচন কেন্দ্রে-র বাইরে নির্বাচনী অফিস করতে হয়। ভোটার তালিকায় কারচুপি করতে হয়। জাল ভোট দেবার ক্যাডার রাখতে হয়। বিরোধী নির্বাচনকর্মীকে নির্বাচনকেন্দ্র থেকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হয়। বিরোধী দলের ভোটারদের গৃহবন্দি, ফ্ল্যাটবন্দি বা গ্রামবন্দি করে রাখতে হয় অস্ত্রের জোরে। রিগিং নিশ্চিত করতে নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যাপক বোমাবাজি করতে হয়, প্রয়োজনে গুলিও চালাতে হয়। বুথ দখল করতে আরও ব্যাপক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও আছে প্রচারের জন্য গাড়ি-পোস্টার-ব্যানার-হোর্ডিং-কাটআউট-ক্যাডার ও গুন্ডা, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদির বিপুল খরচ। সব মিলিয়ে এক-একটা কেন্দ্রের নির্বাচনী খরচ কয়েক কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ খরচের টাকা যেসব ধনীরা দেয়, তারা উশুল করতে পারার প্রতিশ্রুতি নিয়েই দেয়। নির্বাচনের পরও অনেক সময় ত্রিশঙ্কু অবস্থাকে স্থিতি দিতে বিধায়ক ও সাংসদ বেচা কেনা হয়।

যারাই সরকার তৈরি করুক, আর যারাই বিরোধী আসনে বসুক— সব্বাই ধনীদের ধনের দৌলতেই করে খায়। ফলে শেষ পর্যন্ত দেশের আইন এমনভাবে তৈরি হয়, যাতে ধনীরা মসৃণগতিতে শোষণ চালিয়ে যেতে পারে। সরকার যেখানে পুতুল নাচের পুতুল, সেখানে পুলিশ-প্রশাসন-আমলাদের তুড়ি বাজিয়ে নাচানো যায়।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদেরই সমাজের এই কাঠামো ও তার সঙ্গে শোষণের সম্পর্ককে বোঝাতে হবে, নাগরিক হিসেবে সংবিধান আমাদের কিছু অধিকার দিয়েছে। আমরা প্রতিটি দেশবাসী শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, বেঁচে থাকার মতো খাওয়ার অধিকারী। আমাদের এইসব অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। সংবিধান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় পরিষেবার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। বোঝাতে হবে বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা। বোঝাতে হবে 'দেশপ্রেম' মানে দেশের মাটির প্রতি প্রেম নয়। 'দেশপ্রেম' মানে দেশের সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষের প্রতি প্রেম। 'জাতীয়তাবাদ', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ', স্বাধীনতা সংগ্রাম', 'উপাসনা-ধর্ম', 'নিয়তিবাদ' ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে ধারণের মধ্যে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন কখনই সদস্য বাড়িয়ে দল ভারী করার হুজুগ নয়। এই আন্দোলন কিছু এগিয়ে থাকা চিন্তাকে বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আন্দোলন।

রাজনীতিক থেকে আমলার দুর্নীতির, শিল্পপতি থেকে প্রচার মাধ্যমের দুর্নীতির ওপর নজরদারি করবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকারীরাই। দুর্নীতিকে চিহ্নিত করে জনসাধারণের সাহায্য নিয়েই তাদের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে হবে।

বিপ্লব এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, কুসংস্কার, শোষণ, দুর্নীতি সব—এমনটা মনে করা মার্কসবাদীদের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা এ জাতীয় বক্তব্যের পিছনে যে যুক্তি দেন, তা হল —বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ কাঠামো (structure) পালটে দিতে পারলে সমাজের উপরিকাঠামো (superstructure) এমনিই পালটে যাবে। উপরিকাঠামো মানে 'ভাবাদর্শ গত সম্পর্ক; যার মধ্যে পড়ে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, রাজনীতি, মূল্যবোধ, নীতি-দুর্নীতি ইত্যাদি তাঁদের মতে সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তনে উপরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। সমাজ-

কাঠামো হল উপরিকাঠামোর নিয়ন্তা-শক্তি। ফলে যুক্তিবাদী আন্দোলন বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মতো উপরিকাঠামোর আন্দোলন শেষ পর্যন্ত একটি নিষ্ফলা ও অপ্রয়োজনীয় আন্দোলনে পরিণত হতে বাধ্য।

মার্কসবাদ কিন্তু এইসব মার্কসবাদীদের সঙ্গে একমত না হয়ে অন্য কথা বলছে।

"কাঠামোর উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও উপরিকাঠামো কাঠামোকে প্রভাবিত করে। সমাজজীবনে ধ্যানধারণা, সাংস্কৃতিক চেতনার ফল, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাসহ অন্যান্য উপরিকাঠামোগত বিষয়গুলির ভূমিকা, বনিয়াদ বা কাঠামোর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এবং কাঠামো পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে দ্রুত করে।"

(What Is Historical materialism? by Z. berbeshkina L. Yakovle D. Zekin. progress Publishers, 1985. Moscow).

বিপ্লবই শেষ কথা নয়। শোষিত, মেহনতি মানুষদের দ্বারা ক্ষমতা দখলই শেষ কথা নয়। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার পরও তাকে টিকিয়ে রাখাটা জরুরি। তার জন্য একটা লাগাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলন চাই-ই। নতুবা নজরদারির অভাবে গদিতে নেতারা দুর্নীতির সঙ্গে আপস করতে পারে। স্বজনপোষণে ডুবে থাকতে পারে। সবরকম খারাপ কাজই মুখোশের আড়ালে অথবা ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে করে যেতে পারে।

এ দেশের নির্বাচন-নির্ভর মার্কসবাদী পার্টিগুলোর দিকে তাকালেই অবস্থা কিছুটা টের পাবেন। দীর্ঘ ক্ষমতায় থাকা বাস্তুঘুঘুরা বিপ্লব থেকে বহু দূরে সরিয়ে রেখেছে পার্টিকে। সাম্যের সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা তরুণরা আর পার্টি অফিসে স্টাডি ক্লাশ করতে আসে না। পার্টি অফিস প্রমোটর বা ব্যবসায়ীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে থাকে। মন্ত্রী থেকে ক্যাডার সব্বাই নব্য-পুজোকালাচার নিয়ে মেতেছেন। এঁরা ভারতের নিরীশ্বরবাদী চিন্তাধারার ঐতিহ্যকে মেলে ধরবেন—এমন প্রত্যাশা ছিল। আজ সেই প্রত্যাশার কিছুই অবশিষ্ট নেই।

রাজনীতি ও সমাজনীতি-সচেতন অশোক মিত্রের কথা গলায় গলা মিলিয়ে বলতে হচ্ছে, "অধঃপাতের আবর্তে বিরাজ করছি আমরা, শ্রদ্ধা করা যায়, সম্মান জানানো যায়, যাঁদের দৃষ্টান্তে উদ্দীপ্ত হওয়া যায় এমন ব্যক্তির সংখ্যা, পৃথিবীতে না হলেও অন্তত আমাদের দেশে, ক্রমশ ক্ষীয়মাণ; মেরুদন্ডগুলি বেঁকে যাচ্ছে, আরও বেঁকে যাচ্ছে।"

ভারতের এক সময়ের মূল চিন্তাধারা ছিল নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী। কয়েক হাজার

বছরে আমরা কতটা এগোলাম? ইতিহাস বলছে—আমরা পিছিয়েছি এবং এই পশ্চাৎগামিতাই আমাদের সমাজের মূল স্রোত। খাঁটি নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ খুঁজে পাওয়া ভার। যাঁরা নিজেদের নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী বলে জাহির করেন, তাঁদের মধ্যে ভেজালই বেশি।

এ দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতিই ঠিক করে দেয় প্রচার মাধ্যম কী ছাপবে, কী চাপবে, সাহিত্য-শিল্প-সংগীত কেমন হবে, কেমন হবে অর্থনীতি, মূল্যবোধ, আইনের প্রয়োগ। যে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিক এসব ঠিক করে দেয় তারা নিজেদের আদর্শগত অবস্থান নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না। নির্বাচনী রাজনীতিতে কৌশলই আসল। আর এও সত্যি—এদেশে নির্বাচন-নির্ভর রাজনীতিকরাই সন্দোহাতীতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর বাইরে অতিসংখ্যালগু কিছু রাজনীতিক অবশ্য আছেন, সরকার যাঁদের 'সন্ত্রাসবাদী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ইত্যাদি বলে ঘোষণা করেছে। কুকুরকে হত্যার আগে 'পাগলা কুকুর' বলে ঘোষণা করার মতো ব্যাপার আর কি!

এ দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে উপসনা-ধর্মকে কাজে লাগাবার, উসকে দেবার দুর্নীতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় নির্বাচন-নির্ভর মার্কসবাদী দলগুলোও আর্দশ-টাদর্শ শিকেয় তুলে যেভাবে ধর্মে-কর্মে ডুব দিয়েছে, তাতে তাদের কাছে আদর্শের কথা তুলতে যাওয়া মানেই ঝুঁকি নেওয়া। মিথ্যে মামলায় ঝুলে যাওয়ার ঝুঁকি, 'সন্ত্রাসবাদী' বলে দাগি হওয়ার ঝুঁকি, এনকাউন্টারে প্রাণ হারাবার ঝুঁকি।

বুদ্ধিচর্চাহীন, মুক্তমনহীন, ভন্ড, ধান্দাবাজে ভরে যাওয়া এই দেশে একসময়ের এগিয়ে থাকা নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা শুকিয়ে যাচ্ছে। এ ভাবে সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে দেবো কি-না, তা নির্ভর করছে আপনার, আমার আমাদের উপর। আমাদের নিস্পৃহতার চাদর উড়িয়ে দেবার উপর।

জ্ঞান আসে যুক্তির পথ ধরে

যুক্তিবাদের মূল বক্তব্য - জ্ঞানমাত্রেই সঙ্গত কারণ বা যুক্তির (reason) পথ ধরে আসে। আমাদের যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, সে ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বাড়ায়। দৃষ্টি-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের অক্ষর পরিচয়ের শুরু। সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে দৃষ্টি-ইন্দ্রিয়ের অবদানকে স্বীকার করতেই হয়। দৃষ্টির অভাবে ইচ্ছে-মত পড়াশুনো বারবার ব্যাহত হতে বাধ্য। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, ডিসকভারি, অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট, ইস পি এন, বি বি সি, এমনই কত টিভি চ্যানেল আমাদের চোখের সামনে হাজির করে চলেছে নানা তথ্যরাশি, জ্ঞানভান্ডার। সমুদ্রতলার জগৎ, মরুভূমির রহস্যময় পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার, পৃথিবীর নানা প্রান্তের ট্রাইবদের জীবনযাত্রার ছবি, ক্রীড়া-শিল্প-সাহিত্য সংগীত-নাটক চলচ্চিত্রে নানা অগ্রগতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে চলেছে এইসব টিভি চ্যানেল। বিশ্বকাপ ফুটবলের দিকে চোখ রাখেন গোটা পৃথিবীর কোচ ও খেলোয়াড়রা। ক্রীড়াবিজ্ঞান ও নতুন নতুন ট্যাকটিক্যাল লাইন নিয়ে গবেষণা চলে দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। যাঁরা খেলেন তাঁরা দেখতে না পেলে খেলাগুলোর চরিত্র যেত সম্পূর্ণ পালটে। হয়তো তখন খেলাগুলো হত শব্দনির্ভর বা স্পর্শনির্ভর।

আমাদের জ্ঞানের অনেকটাই আসে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বক্তব্য বা লেকচার শুনে গান শিখি গান শুনে, এমনকি কথা শিখি কথা শুনে। অক্ষরের উচ্চারণের সঙ্গে পরিচয় মাধ্যমও শব্দ। আমরা শৈশবে সুর করে নামতা পড়েছি গলা মিলিয়ে। শিখেছি 'অ-য়ে অজগর .....' ছড়া। আজ হয়তো ছড়া পালটেছে, কিন্তু আমার নাতিও নার্সারিতে ভর্তি হয়ে অক্ষরজ্ঞানের আগেই ইংরেজি কবিতা বলা শিখে ফেলেছে। সেই প্রাচীন শ্রুতির ট্রাডিশান আজও বজায় রয়েছে। শুনেছি কলকাতার আকাশবাণীর এফ. এম. ব্যান্ডের শ্রোতার সংখ্যা নাকি ২৮ লক্ষ। এদের মধ্যে একটা অংশ নাকি সরাসরি ফোনে নানা আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনাগুলো নানা যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে। এসব শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবদান। এমনি করেই সব ইন্দ্রিয়ই আমাদের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে।

সমকালীন যুক্তিবাদ
(Contemporary Rationalism)

'সমকালীন যুক্তিবাদ' (Contemporary Rationalism) প্রথমত একটা দর্শন। দ্বিতীয়ত একটা খন্ডিত দর্শন নয়, সম্পূর্ণ দর্শন। তৃতীয়ত, চিরকালীন, চির আধুনিক দর্শন। কারণ এই দর্শন 'সমকালীন দর্শন', সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পা মিলিয়ে এগোয়। শিখতে শিখতে পালটায়, পালটাতে পালটাতে শেখে।

আমরা ইতিমধ্যে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় গিয়েছি। বুঝেছি যুক্তির পথ ধরে-ই সব কিছুকে ঠিকঠাক বোঝা সম্ভব, দেখা সম্ভব। যুক্তিই আমাদের খোঁজ দেয় ইন্দ্রিয়ের নানা ভ্রান্তির, কার্য-কারণ সম্পর্কের। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের বির্বতনের প্রতিটি স্তরে আমাদের যুক্তিবোধ পালটায়, পালটায় নীতিবোধ। যুক্তিবাদ একটি অনড় দর্শন নয়। যুক্তিবাদ শিখতে শিখতে পালটায়, পালটাতে পালটাতে শেখে।

'দর্শন' হল জীবন ও বিশ্বব্রহ্মান্ডকে দেখার পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি। যুক্তিবাদ এমন-ই দৃষ্টিভঙ্গির যার সাহায্যে আমরা জীবন ও বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের সব কিছুই দেখতে পাই, বুঝতে পারি। এগিয়ে থাকা মানুষরা যুক্তিবাদকে 'দর্শন' হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সমাজ বিবর্তনের শেষ পর্যন্ত অনিবার্য অগ্রগতির কথা মাথায় রাখলে বলতে হয়, যুক্তিবাদের এই স্বীকৃতি অনিবার্য ছিল।

যুক্তিবাদ দর্শনের অন্যতম প্রধান নীতি হল, পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের পরই আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত। কোনও কিছুকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার অর্থ — আত্মবিনাশের পথ পরিষ্কার করা।

'সমকালীন যুক্তিবাদ', (Contemporary Rationalism)'তর্কশাস্ত্র' (Logic) নয়। এতদিনকার পাশ্চাত্য চিন্তার দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'যুক্তিবাদ' (Contemporary Rationalism) বা 'নয়া যুক্তিবাদ' (New Rationalism) নয়। 'যুক্তিবাদ', ও 'নয়া যুক্তিবাদ'-এর সঙ্গে বাড়তি কিছু। (আমরা একটুপরেই 'তর্কশাস্ত্র', 'পাশ্চাত্যের 'যুক্তিবাদ' ও 'নয়া যুক্তিবাদ' নিয়ে যখন আলোচনায় যাব, তখন বিষয়গুলো ও পার্থক্যগুলো পরিষ্কার হবে।') 'নব্য যুক্তিবাদ' হল 'সমকালীন যুক্তিবাদ'-এর এর আগের ধাপ। 'নব্য যুক্তিবাদ'-এর সীমাবদ্ধতা আছে। সীমাবদ্ধতার কারণে এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুকে দেখা ও বিশ্লেষণ করার দর্শন-ই হয়ে উঠতে পারেনি, 'দর্শন' হিসেবে সর্বকালের গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া তো দূরের কথা।

যুক্তিবাদী সমিতির কলকাতার স্টাডি ক্লাসে একটি সন্ধ্যা। 'মানবতাবাদী সমিতি'র (Humanists Association) সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা বক্তব্য রাখছিলেন বিষয়—যুক্তিবাদ। কথাগুলো ভালো লেগেছিল। তাই এখানে তুলে দিলাম—

'যুক্তিবাদ ছিল, আছে, থাকবে। যেমন 'বিজ্ঞান' ছিল, আছে, থাকবে। যুক্তিবাদের আরেক নাম তাই বিজ্ঞানমনস্কতা। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করার আগেও গাছ থেকে আপেল পড়ত। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছিল। মানুষ শুধু তাকে আবিষ্কার করেছে। তাকে সূত্রবদ্ধ করে তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগিয়েছে। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। ঠিক তেমনই যখন গুহামানব প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখল, চাষ করতে শিখল, নিজের প্রয়োজনে পশুপালন করতে শুরু করল, তখন থেকেই তো, সভ্যতার সেই প্রথম লগ্ন থেকেই তো যুক্তিবাদের জয় দেখতে পাচ্ছি।

এখন এই ধর্মোন্মাদনার যুগে শুধু আমরা 'সমকালীন যুক্তিবাদ'-কে একটা বিষয় হিসাবে, একটা সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শন হিসাবে বুঝতে চাইছি এবং বোঝাতে চাইছি—যার কোনও বিকল্প নেই। 'সমকালীন যুক্তিবাদ' চিরকাল-ই সমকালীন, চিরকাল-ই আধুনিক বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি।

যুক্তিবাদ নিয়ে যায় মানব চেতনাকে বৃহত্তর পরিধিতে, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর স্বার্থের ঐক্য অনুভবে। এখানেই মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়। বিশুদ্ধ মানবতাবাদের একটা বিশেষ গুণ আছে। তার ঝোঁক ব্যক্তি থেকে সমষ্টির দিকে, বিশ্বজনীনতার দিকে। তার লক্ষ্য-প্রতিটি মানুষের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরির দিকে। লক্ষ্য পূরণের একমাত্র পথ সমকালীন যুক্তিবাদ। সমকালীন যুক্তিবাদ নিয়ে যায় মানব চেতনাকে বৃহত্তর পরিধিতে, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর স্বার্থের ঐক্য অনুভবে।

'ঈশ্বরে বিশ্বাস', বিজ্ঞানের বিশ্বাস' ঃ আকাশ-পাতাল

ধর্মগুরু, অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ তোলেন। অভিযোগগুলোর মূল সুর এই ধরনের ঃ-

গোরুর গাড়ির চাকা থেকে মহাকাশ বিজয়—বিজ্ঞানের প্রতিটি জয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের চিন্তা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনা ও প্রয়োগ। প্রয়োগ মানেই সফলতা নয়। প্রয়োগে ব্যর্থতা আসতে পারে। আবার ব্যর্থতা মানে অনেক সময়ই সাফল্যের ধাপও; এটাও মনে রাখতে হবে।

আদিম মানুষ গতি বানাতে চাকা বানিয়েছে। এই চাকা বানাবার আগে একটি কল্পিত বিশ্বাস নিয়ে চিন্তার জগতে কাজ শুরু করেছিল। একটা কাঠামোর সঙ্গে দুটো বা চারটে চাকা জুড়ে দিলে কেমন হয়? একটা গৃহপালিত পশু তার পিঠে চাপলে যতটা বোঝা বইতে পারে, চাকা লাগানো কাঠামোটি পশুর পিঠে জুড়ে দিলে তার চেয়ে অনেক বেশি বইবে। এই চাকার গড়নটা যে গোল করলে সুবিধে হবে, সেই ভাবনাটা, বিশ্বাসটা আগে চিন্তায় এসেছে, তারপর প্রয়োগ।

চাকা থেকে মারণ রোগের ওষুধ, মহাকাশ গবেষণা—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আগে গবেষকের মাথায় চিন্তা এসেছে, একটা কল্পিত বিশ্বাস এসেছে। তারপর তার প্রয়োগ এসেছে। বিজ্ঞানের কল্পিত পরীক্ষার শুরু হয় কোনও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই।

যুক্তিবাদীরা বিজ্ঞানের এই বিশ্বাস-নির্ভরতাকে দোষণীয় মনে করেন না; আর আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের বেলায় যত দোষ! এ' হল যুক্তিবাদীদের স্ববিরোধীতা। এ'হল যুক্তিকে বাদ দেওয়া নিজের স্বার্থে। যুক্তিবাদীরা কোনও পরীক্ষা না চালিয়েই বলে দেন - ঈশ্বর নেই। এও তো তাঁদের বিশ্বাসের কথা।

বিজ্ঞানের 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। বিজ্ঞানের জগতে এই ধরনের বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে কোনও কাজই হয় না। 'বিজ্ঞান' বলতে 'পরীক্ষা', পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্ত' নামের যে অতি সরলীকৃত একটি সংজ্ঞা চালু আছে, সেটাও পুরোপুরি ঠিক নয়। বিজ্ঞানে তত্ত্ব আছে, অঙ্ক আছে, আবার পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ আছে। বিজ্ঞানের পরীক্ষা বলতে শুধুমাত্র গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা বোঝায় না। বিজ্ঞানের পরীক্ষায়

রয়েছে একটি কল্পিত প্রস্তাবনা বা Hypothesis, যে প্রস্তাবনা যাচাই শেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রস্তাবনায় পৌঁছাতে কল্পিত পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, অঙ্কের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি রয়েছে যে বিষয় নিয়ে গবেষণা হবে, সেই বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত যে-সব গবেষণা ইতিপূর্বে হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলো জানা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে সেগুলোর সঙ্গতির পরীক্ষা প্রস্তাবনার সঙ্গতির পরীক্ষা। প্রয়োজনমত কল্পিত প্রস্তাবনার পরিবর্তন করা। এরপর আসে কল্পিত প্রস্তাবনা বা তত্ত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে ফলাফলের পরীক্ষা।

খুব সংক্ষেপে 'পরীক্ষা' শব্দটিকে আমরা ব্যবহার করেছি। বাস্তবে অসংখ্য পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের তত্ত্বকে যাচাই করা হয়, তারপর আসে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার প্রশ্ন। এ'ভাবে যাচাই করার আগে বিশ্ব-বিখ্যাত বিভিন্ন গৃহীত তত্ত্বও ছিল প্রস্তাবনা মাত্র।

বিজ্ঞানের কল্পিত প্রস্তাবনার সঙ্গে জড়িত বিশ্বাসগুলো এসেছে পূর্বসূরি বিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বও নানা গবেষণা থেকে। এই বিশ্বাসের সঙ্গে সত্যের একটা সম্পর্ক থাকে।

ঈশ্বরকে নিয়ে বা পক্ষীরাজ ঘোড়ার অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞান কেন গবেষণার প্রথম পর্যায় কল্পিত পরীক্ষায় যাবে না, তার পিছনে অবশ্যই জোরালো কারণ আছে। ঈশ্বর বা পক্ষীরাজ ঘোড়ার অস্তিত্ব শুধু বইয়র লেখা আর আঁকা ছবিতে পাওয়া গেছে। তেমন লেখা ও ছবি হাঁসজারু, বকচ্ছপ থেকে রাক্ষস অনেক বইতে-ই পাওয়া যায়। কল্পনার মিথ্যের ওপর ভিত্তি করে আর যাই হোক বিজ্ঞানের কল্পিত প্রস্তাবনা তৈরি হয় না। ঈশ্বর দেখার দাবিদার বা ভক্তদের প্রচারে বিশ্বাস করে বিজ্ঞান কল্পিত প্রস্তাবনায় নামতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানের একটি শাখা মনোবিজ্ঞানের কাছে ঈশ্বর-দর্শনের কার্য-কারণ সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের অস্বাভাবিকতা থেকেই মানুষ অলীক দেখে। অলীক দর্শনে ঈশ্বর এলে মানুষটি পুজো পায়, আর অভিনেত্রী করিশমা এলে পাগল বলে গাল খায়।

যদি কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবিদার প্রকাশ্যে, নিরপেক্ষভাবে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার কাছে হাজির করতে পারতেন, শুধু তবে-ই বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর নিয়ে কল্পিত পরীক্ষায় নামার প্রশ্ন আসত।

ঈশ্বর নিয়ে বিজ্ঞানের কল্পিত পরীক্ষায় যাওয়ার বড়ো বাধা হল বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলো। মুসলিমরা যদি বলেন, ঈশ্বর নিরাকার; তো হিন্দুরা কয়েক হাজার দেব-দেবীর মূর্তি পুজো করে বুঝিয়ে দেন ঈশ্বরের আকার আছে। আবার হিন্দু ধর্মে এই নিয়ে লাঠালাঠি কম নেই। অনেক হিন্দুর কাছেই ঈশ্বর নিরাকার। আবার জৈনরা মনে করেন, মানুষই জৈন ধর্মের নিয়ম-নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে দেবতা হতে পারেন।

এ ত যত ধর্মমত তত বিভাজন। ঈশ্বর নিয়ে উপাসনা-ধর্মগুলোর মধ্যেকার বিরোধীতা আমাদের কাছে তাদের বিশ্বাসের অসারতারই স্পষ্ট করে দেয়। ধর্মমতগুলো নিজেদের

মধ্যে বসে 'ঈশ্বর'-এর একটা সর্বধর্মমত-গ্রাহ্য সংজ্ঞা তৈরি করার প্রাথমিক কাজটুকু আগে শেষ করে ফেলুক।

তারপর ধর্মগুরুরা নামবেন পরবর্তী বাধাগুলো অতিক্রম করতে। খুঁজে হাজির করবেন এমন ধর্মগুরু, যিনি প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখাবেন। তখন বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ ঈশ্বর নিয়ে কল্পিত পরীক্ষায় নামার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন।

এ'সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিয়ে বোকা বোকা চেঁচাবেন না যে—যুক্তিবাদীরা কোনও পরীক্ষা না চালিয়ে বলে দেন ঈশ্বর নেই।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস' আর 'বিজ্ঞানের বিশ্বাস'-এর পার্থক্য কোথায়।

প্রচারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে লিফলেট, পুস্তিকা ইত্যাদি নিয়ে পালটা প্রচারে নেমেছে এ'দেশের ও বাংলাদেশের যুক্তিবাদীরা। ওরা মনে করে, 'আধুনিক যুক্তিবাদ দর্শন'-এর স্রষ্টা কোনও দেশের একান্ত সম্পত্তি নন। তাঁর উপর যে পরিকল্পিত লাগাতার আক্রমণ চালানো হচ্ছে তা পৃথিবীর তামাম যুক্তিবাদী দর্শনে আস্থাশীলদের ওপর আক্রমণ। যুক্তিবাদের ওপর আক্রমণ।

গত শতকের ন'য়ের দশক থেকে একটা বিষয় অনেকেরই নজরে পড়েছে। 'সমকালীন যুক্তিবাদী' দর্শনের স্রষ্টার ওপর সর্বাত্মক আক্রমণের পাশাপাশি দু-তিনজন ব্যক্তিকে 'একালের বিশিষ্ট যুক্তিবাদী' বলে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। এঁদের একজন একটি রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞান সংগঠনের সভাপতি ও পাড়ার দুর্গাপূজা কমিটির সভাপতি। আর একজন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বইপত্তর লেখেন, পুজো ও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভাববাদী বই'কে প্রশংসা করে সার্টিফিকেট দেন। তৃতীয় জন গ্রহরত্নের আংটি পরেন, পুজো করেন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বই লেখেন। বইয়ের উদ্বোধন করেন কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে। 'দামী যুক্তিবাদী', তাই পুজো দিয়ে বই উদ্বোধনের খবরও ছাপা হয় খবরের কাগজে।

এর বিষময় ফল ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে। সাচ্চা যুক্তিবাদীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঝুটা যুক্তিবাদীদের সংখ্যা। এমন যুক্তিবাদী সংস্থা বা বিজ্ঞান-ক্লাবের সংখ্যা কম নয়, যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাগা-তাবিজধারী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলো। এঁরা 'যুক্তিবাদ দর্শন' বিষয়টা নিয় তত্ত্বগতভাবে কিছুই জানেন না। জানার প্রয়োজনও বোধ করেন না। এঁদের কাছে যুক্তিবাদ শুধুই একটা ফ্যাশন। প্রগতিশীল সাজার ফ্যাশান।

উদ্ভিদ ও প্রাণীগজগতের বিবর্তনের মতো বিবর্তন ঘটে চলেছে আরও অনেক ক্ষেত্রেই। যেমন উপাসনা-ধর্মের বিবর্তন, বিজ্ঞানের বিবর্তন, দর্শনের বিবর্তন।

দর্শনের বিবর্তনের একটা ইতিহাস আছে। যুক্তিবাদী দর্শনের উত্তরণ বা বিবর্তনেরও একটা ইতিহাস আছে। সেই আদিম যুগে বেঁচে থাকার তাগিদে, শিকারের তাগিদে আমরা গাছের ডালের মুখ ঘষে ছুঁচালো করে হাতিয়ার করেছি। পাথর ঘষে ধারালো অস্ত্রের চেহারা দিয়েছি। আগুনের ব্যবহার শিখেছি। সৈন্য ও সম্পদ গণনার তাগিদে সৃষ্টি হল পাটিগণিতের। জমি মাপ-জোকের প্রয়োজনে এল জ্যামিতি। শস্য উৎপাদনের স্বার্থে ঋতু পরিবর্তনের হিসাব রাখতে গিয়ে সৃষ্টি হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের। যুক্তি-গণিত-বিজ্ঞান সবই আমাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের অঙ্গ। আমাদের যুক্তি-বুদ্ধির বিবর্তনের ইতিহাস। এমনি করেই মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির কয়েক হাজার বছরের বিবর্তন আমাদের পৌঁছে দিয়েছে মহাকাশ ও কম্পিউটারের যুগে। এই বিবর্তন শুধু প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের বেলায় ঘটেনি। ঘটেছে খেলা, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, নৃত্য, সিনেমা, চিন্তায়, দর্শনে। 'সমকালীন যুক্তিবাদ' দর্শনেরই এক চূড়ান্ত বিবর্তিত রূপ।

'তর্কবিদ্যা ও 'যুক্তিবাদ' এক নয়

তর্কবিদ্যা অর্থাৎ ন্যায় দর্শনের সঙ্গে সমকালীন যুক্তিবাদী দর্শনের একটা বড়ো রকমের পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় ভাববাদীরা বেদ ও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকে অভ্রান্ত, স্বতঃপ্রমাণ ধরে নিয়ে তারপর বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের নানা বক্তব্য নিয়ে নিজেদের মতো করে টীকা বা ব্যাখ্যা হাজির করেন। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকে। সেই পার্থক্যের কারণে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে যুক্তি-তর্কের লড়াই চলে। বেদ ও ধর্মশাস্ত্রকে অভ্রান্ত ধরে নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বা টীকাকারদের এই তর্ককেই 'তর্কবিদ্যা' হিসেবে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রধান গৌরবের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'তর্কবিদ্যা' কখনই 'যুক্তিবাদ' হয়ে ওঠেনি। কারণ, প্রথমেই ধর্মশাস্ত্র বা বৈদিক সাহিত্যকে অভ্রান্ত ধরে নেওয়ার পিছনে কোনও যুক্তি নেই।

'সমকালীন যুক্তিবাদ'-এর পালের হাওয়া কাড়তে অনেকেই

'আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান, তার লাগি কাড়াকাড়ি', সমকালীন যুক্তিবাদের পালে হাওয়া কাড়তে রাষ্ট্রশক্তির গেটের কাছে বুদ্ধিজীবীদের বিশাল লাইন। লাইনে শামিল যুক্তিবাদী-বুদ্ধিবাদী-কৌশলবাদী-এন জি ও'বাদীরা। রাষ্ট্রশক্তির কাছে ওঁরা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণি। শত হলেও সমাজ কাঠামোর চারটে পায়ার একটা তো ওঁরাই।

'রাষ্ট্র' মানে তো আসলে শোষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার; সমাজে শোষক-শাসক দু'টি শ্রেণি থাকলে রাষ্ট্র-চরিত্র এমনটাই থাকবে। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হবে ধনী-শোষকদের একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। এই রাষ্ট্রকে টিকে থাকতে কিছু সহায়ক শক্তির প্রয়োজন হয়।

যেমন, (১) শাসক হতে চাওয়া, গদিতে বসতে চাওয়া রাজনৈতিক দল। যারা শোষণ কে তৈলমসৃণ করতে শোষকদের স্বার্থরক্ষাকারী নানা আইন তৈরি করবে। (২) সেনা-পুলিশ প্রশাসন। যারা শোষিত মানুষদের উসকে দেওয়ার চেষ্টা কে কড়া হাতে দমন করবে। (৩) প্রচার মাধ্যম। মাধ্যমগুলোর ক্রোড়পতি মালিকরা প্রয়োজনমতো, কৌশল ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আমজনতার মগজ ধোলাই করে যাবে। (৪) বুদ্ধিজীবীরা, যাঁদের কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের লেখায়-রেখায় প্রতিটি সৃষ্টিতে মগজ ধোলাই করবেন। বেয়াদপ মানুষদের আন্দোলনের পালের হাওয়া কাড়তে মেকি বেয়াদপ মানুষ তৈরি করবে। রাষ্ট্রের পক্ষে-কোনও বিপদ্‌জনক তত্ত্বকে ঠেকাতে যা দরকার রাষ্ট্র সব করবে।

এক প্রাক্তন নকশালপন্থী নেতার একটা লেখা পড়ছিলাম 'উদবুশ' পত্রিকায়। যতই পড়ছিলাম, বিস্ময়ের পারদ ততই চড়চড় করে ওপরে উঠছিল। এ' যেন কোনও লালটুকটুকে মানুষের লেখা নয়, গেরুয়া কারও লেখা? তিনি লিখেছেন, "যুক্তির একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকে । সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, পশ্চিমে ডোবে, এটা যুক্তিবাদ, যে কেউ মেনে নেবে, কিন্তু এটা তো সত্যি নয়। সূর্য ওঠে না ডোবেও না, আসল সত্য হল এটাই। যুতরাং

'যুক্তিবাদী' আর 'সত্যবাদী' এক ব্যক্তি নন। যুক্তিবাদ শেষ বিচারে টুপি-পরানোর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ।"

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে যেমন ঘুরছে, তেমনই নিজের মেরুদন্ডের চারপাশে লাট্টুর মতো ঘুরে চলেছে। এই লাট্টু গতির জন্যই পৃথিবীর মানুষ সূর্যের উদয় ও অস্ত দেখে। এই দেখাটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। এও সত্যি-সূর্য ওঠে না, ডোবেও না। এটা আজকালকার ফাইভ-সিক্সের ছাত্র-ছাত্রীরাও জানে। ওরা এ'সব জেনেছে বিজ্ঞানের বই থেকে। আর বিজ্ঞান জেনেছে যুক্তির পথ ধরে।

বস্তুময়তা এবং বাস্তব পরিবর্তনশীলতার ধারণা ছাড়া যুক্তি দাঁড়ায় না। যুক্তিবাদ আসলে বস্তুবাদ-ই।

এক সময়ের কট্টর বস্তুবাদী মানুষটির কত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে, দেখে চমকালাম, দুঃখিত হলাম। প্রাক্তন নকশাল নেতা উচ্চশিক্ষিত, লেখাপড়ায় ভালো। ন'য়ের দশকের এক্কেবারে গোড়ায় যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় অফিসে এসে যুক্তিবাদের পক্ষে স্টাডি ক্লাশও পরিচালনা করেছিলেন। যুক্তিবাদের পক্ষে কত না কথার ফুলঝুরি জ্বালিয়েছিলেন সে'দিন। আর আজ কি-না লিখেছেন—সূর্য ওঠে না ডোবে না, বিজ্ঞানের এই সত্য যুক্তিবাদীরা মানেন না! কেন তাঁকে এমন অদ্ভুত কথা লিখতে হল? যুক্তিবাদীদের সম্বন্ধে এমন বোকা-বোকা ভাবনা তাঁর মতো শিক্ষিতের তো থাকা উচিত নয়! তবু কেন এল? প্রাক্তন বিপ্লবী আরও লিখেছেন— সূর্য ওঠেও না, ডোবেও না। অতএব যুক্তিবাদীরা মিথ্যেবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল।

বুদ্ধের ক্ষণিকবাদের অণুবীক্ষণের তলায় বিপ্লবীকে ফেললে রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায়। তিরিশ বছর আগের বিপ্লবী আর আজকের প্রতিবিপ্লবী মানুষটি এক নন। সময়ই তাঁকে পালটে দিয়েছে। তিনি এখন রাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবীদের লাইনে আছেন। রাষ্ট্র চায়, তাই তিনি যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে সরব।

'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' যত দিন শুধু বাবাজি-মাতাজিদের 'ভান্ডাফোড়' করছিল, ততদিন এ'সব খবর বাজারে বিক্রি করতে উদ্যোগী ছিল অনেক প্রচার মাধ্যম-ই।

যখন রাষ্ট্রশক্তির মনে হল, ওরা গরিব মানুষগুলোর মাথায় চেতনার আগুন জ্বালাতে চাইছে, তখনই রাষ্ট্র নামল যুক্তিবাদী সমিতির বিরুদ্ধে। যুদ্ধে জেতাটাই নীতি। রাষ্ট্র বিভিন্ন দিক থেকে এক সঙ্গে সাঁড়াশি আক্রমণ চালাল। এক দিকে রাষ্ট্রের অর্থানুকূল্যে বিদেশি অর্থে গজিয়ে উঠল অনেক যুক্তিবাদী সংগঠন ও বিজ্ঞান ক্লাব।

যুক্তিবাদী সমিতি ও তার সহযোগী সংগঠন মানবতাবাদী সমিতিকে ভাঙতে টোপ ফেলা হল নানা ধরনের। আর একদিকে, দেশের মানুষ যুক্তিবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা বলে যাঁকে গ্রহণ করেছে, তাঁকে ঠেকাতে অতীত ও বর্তমানের অনেককে 'যুক্তিবাদী' বলে প্রচার শুরু হল।

আর একদিকে কিছু বুদ্ধিজীবীকে দিয়ে অপপ্রচার শুরু হল —যুক্তিবাদ প্রতিক্রিয়াশীলদের মতবাদ; যুক্তিবাদ মার্কসবাদ-বিরোধী; যুক্তিবাদ খ্রিস্টপূর্বেও ছিল; যুক্তিবাদ ও চার্বাকবাদ একই মতবাদ, যার শেষ পরিণতি ভোগবাদ।

আমরা প্রচার মাধ্যমগুলোর কল্যাণে জেনেছি, তিন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্বের জন্মশতবর্ষ পালনে সরকারি নানা উদ্যোগের খবর। "সবই কালের বিচারে সাম্প্রতিক ঘটনা। আমরা প্রচারের কল্যাণে জানলাম, প্রশান্ত মহলানবিশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এবং জে বি এস হ্যালডেন নিখাদ যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন ও বিজ্ঞান পত্রিকা এঁদের জন্মদিন পালন করলেন।

তিনজনই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশাল প্রতিভার অধিকার, এ'নিয়ে দ্বিমত নেই। তাঁদের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শতবর্ষ পালন—অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা; এ বিষয়ে ও দ্বিমত নেই। দ্বিমতটা অন্য জায়গায়; ওদের তিনজনকে আদর্শ যুক্তিবাদী হিসেবে প্রচারে নামার বিরুদ্ধে। ওঁদের বিশাল কর্মকান্ডের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলে আমজনতা শ্রদ্ধায় আপ্লুত হতেন এর জন্য যুক্তিবাদী সাজাবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বরং উদ্যোক্তাদের মিথ্যাচারিতা তিন ব্যক্তিত্বকে অসম্মান-ই করেছে।

এমন প্রচারে নামার পিছনে আরও গভীর কোনও অভিসন্ধি থাকতে-ই পারে। রাষ্ট্রশক্তি চায়, সাধারণ মানুষ 'যুক্তিবাদী' বলতে সেইসব চরিত্রকে আদর্শ বলে গ্রহণ করুক যাঁরা যুক্তিতেও আছেন, আবার ঈশ্বর , নিয়তিবাদ, অলৌকিক বিশ্বাসেও আছেন। বিবেকানন্দকে যুক্তিবাদী বানাবার চেষ্টা এই ষড়যন্ত্রের ফল। উদ্দেশ্য, জনগনকে বোকা বানিয়ে আসল যুক্তিবাদীদের আগ্রাসন রোখা।

প্রশান্ত মহলানবিশ 'নিষ্ঠাবান' ব্রাহ্ম। ব্রহ্ম বা পরমপিতায় বিশ্বাসী। ব্রাহ্মধর্ম প্রেতচর্চা ও প্ল্যানচেটে বিশ্বাসী না হলেও প্রশান্ত মহলানবীশ এ'সবে বিশ্বাসী ছিলেন, জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্র-জীবনীগ্রন্থ আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা নেড়ে চেড়ে দেখতে পারেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঈশ্বরে ও অলৌকিত্বে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। অনেক অলৌকিক বাবার চরণে মাথা ঠেকাতে তিনি যেতেন। সে'সব তাঁর ছাত্র-ছাত্রী বহু বিজ্ঞানীদেরই অজানা নয়। কিছু কিছু অলৌকিকবাবারা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভক্তি-গদগদ সার্টিফিকেট ও ছবি নিজেদের প্রচারমূলক বইতে ছেপে থাকেন।

জে বি সে হ্যালডেন সম্পর্কে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা বলা হয় তা হল —"হ্যালডেন শুধুমাত্র একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সামাজিক দায়বদ্ধ এক মহান পুরুষ। সমাজতন্ত্রের প্রতি আমরণ তাঁর আস্থা ছিল।"

.....একদিকে বিজ্ঞানের গবেষণা অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া, এই ছিল তাঁর আদর্শ।" (কথাগুলো হ্যালডনের 'The Inequality of Man and other Essays' নামের প্রবন্ধ সংকলন থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধের বাংলা 'অনুবাদ মানুষের বিভিন্নতা'য় প্রকাশিত প্রকাশকের নিবেদন'-এর অংশবিশেষ।) যে কলম থেকে উৎসারিত হ্যালডনের সমাজতন্ত্রের প্রতি আমরণ আস্থার কথা, সেই কলমই কিন্তু হ্যালডনের ই এস পি ও টেলিপ্যাথি বিশ্বাসে আমরণ আস্থা বিষয়ে নীরব থাকে। হ্যালডনের নিজের কথায়, "আমি বুঝি না যে একজন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী কেন পূর্বসিদ্ধভাবে টেলিপ্যাথি বা অলৌকিক দৃষ্টির ঘটনা বলে যা দাবি করা হয় সেগুলির সম্ভাবনা অস্বীকার করবেন।" "The Marxist Philosophy and the Sciences" গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন; জে বি এস হ্যালডেন। প্রকাশক চিরায়ত প্রকাশন। ১৯৯০; পৃষ্ঠা ১০।

অর্থাৎ হ্যালডেন টেলিপ্যাথিসহ বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার বস্তুবাদীরা না মানায় যথেষ্টই বিস্মিত এবং কিছুটা ক্ষুব্ধও। তাঁর মতে, এ'সব বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতারণা হতে পারে, কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্যই নয়। কী সর্বনাশ! হ্যালডেন একই সঙ্গে মার্কসবাদে ও অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাস রেখেছিলেন।

হ্যালডেনকে যখন বিভিন্ন মহল থেকে 'বস্তুবাদী' বলে প্রচার করা হচ্ছে, তখন হ্যালডেনের নিজের লেখায় আমরা পাচ্ছি, "আমি নিজে বস্তুবাদী নই, কারণ বস্তুবাদ যদি সত্য হয় তা হলে আমার ধারণা, আমরা জানতে পারি না যে সেটা সত্যি। আমার মতামতগুলি যদি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে চলতে থাকা রসায়নিক ক্রিয়ার ফলে হয়, তা হলে সেগুলি নির্ধারিত হয় রসায়নের নিয়মে, যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মে নয়।" (মানুষের বিভিন্নতা, হ্যালডেন, পৃষ্ঠা - ৬৮)-এর পরেও হ্যালডেনকে বস্তুবাদী মহান মার্কসবাদী বলে 'প্রজেক্ট' করা কি নীতিগর্হিত নয়: মিথ্যাচারিতা নয়? উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বস্তুবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের মেলবন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নয়?

চার্বাক থেকে দেকার্ত এবং যুক্তিবাদ

বুদ্ধ, মহাবীর, চার্বাক, স্পিনোজা, কান্ট, হেগেল, দেকার্ত, ভলতেয়ার, কোভুর, ডিরোজিও , আরাজ আলি মাতুব্বর প্রমুখ যুক্তিবাদী মানুষ যুক্তিবাদী আন্দোলনকে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন। কালের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে তাঁরা যা করেছেন, তাতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়।

পূর্বসূরিদের চিন্তা-ভাবনা অভিজ্ঞাতাই আমাদের যুক্তিবোধ ও জ্ঞানকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই এগিয়ে যাওয়ায় পূর্বসূরি চিন্তাবিদ থেকে বিজ্ঞানী কেউ-ই ছোট্টে হন না। প্রাচীনের অবদান শ্রদ্ধা বা স্বীকৃতি হারায় না। এই বইটি শুরু থেকে যাঁরা পড়ে এখানে এলেন, তাঁরা এই ভাবধারার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন।

গত শতকের ন'য়ের দশকে এসে আমরা হঠাৎ-ই দেখলাম কিছু বুদ্ধিজীবীর 'যুক্তিবাদ' নিয়ে লেখা। লেখাগুলোয় তাঁরা একটা ছাপ মানুষের মনে ফেলতে চাইছেন যে, চার্বাক, দেকার্ত, স্পিনোজা, হেগেল, কান্ট ইত্যাদি মানুষগুলো বর্তমান যুক্তিবাদীদের আদর্শ চরিত্র হওয়ার যোগ্য। যুক্তিবাদের এই পূর্বসূরিরা কালের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আজও অনুসরণীয়।

দেকার্ত ঈশ্বরের ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। স্পিনোজার দর্শনও ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সঙ্গী করেই। লিবানিজ তাঁর দর্শনে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন ঈশ্বর ও আত্মা-বিষয়ক ধর্মীয় মতবাদকে। কান্ট ঈশ্বর ও আত্মার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন।

এঁদের যারা 'আধুনিক যুক্তিবাদীদের' অনুকরণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা কি না জেনে-বুঝেই এসব কথা বলেছেন? নাকি অন্য পরিকল্পনা আছে মাথায়? ঈশ্বরে ও যুক্তিতে অবস্থানকারী হাঁসজারু-মার্কা 'যুক্তিবাদী' গড়ার পরিকল্পনা?

যুক্তিহীন অধ্যাত্মবাদী চিন্তাকে বাতিল করার ঝাঁঝ চার্বাকবাদে যতখানি উপস্থিত, ততখানি অনুপস্থিত ভবিষ্যৎমুখী মানবতাবাদী সমাজ-সচেতনতাবোধ। চার্বাক দর্শনে আর্থ-

সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে সাম্যের সমাজ গড়ার কোনও চিন্তা ছিল না। চার্বাকবাদীরাও ছিল সেই সময়কার রাজতন্ত্রকেন্দ্রিক শোষণ কাঠামোর সমর্থক। আমাদেরই ঠিক করতে হবে, আমরা সেই চার্বাক নিয়েই চর্বিত চর্বণ করব, নাকি আরও যুগোপযোগিতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাব যুক্তিবাদকে।

ডিরোজিও যৌবনে পা দিয়েই ঝরে যাওয়া একটি জীবন। এরই মধ্যে তিনি ভারতীয় সমাজের স্থূল কুসংস্কার মুক্তির জন্য অনেক কাজ করেছেন। তাঁরই জন্য জনা কুড়ি ছাত্র ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ খাবার খেয়েছেন, কালী ঠাকুরকে নিয়ে ছড়া কেটেছেন। ডিরোজিওর যুক্তিবাদী চিন্তা শুধুমাত্র কিছু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল।

ডিরোজিওর 'যুক্তিবাদ' কখনই বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি বা জীবনদর্শন হয়ে ওঠেনি। ডিরোজিওর যুক্তিবাদ দিয়ে সৌন্দর্যবোধ থেকে নীতিবোদ ইত্যাদি বাস্তব বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল না। ডিরোজিয়ানপন্থী ধনীর সন্তানদের অনেকেই ডিরোজিওর কুসংস্কার মুক্তির চিন্তাকে আত্মস্থ করতে পারেননি; তাই তারা, পরবর্তীকালে ক্রিস্টান হয়েছিলেন, কেউ প্ল্যানচেটের আসর বসাতেন।

ডিরোজিওর কুসংস্কার মুক্তির চেষ্টাকে যে-কারণে আমরা যুক্তিবাদী দর্শন বা বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়কে দেখার ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি মনে করি না, সেই কারণে কোভুরের যুক্তিবাদকে আমরা কোনও ভাবেই 'যুক্তিবাদী' দর্শন' বলতে পারি না। কোভুর কুসংস্কার মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছেন। তারজন্য তাঁকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাই।

এ'দেশের বুদ্ধিজীবীরা যাঁদের 'যুক্তিবাদী' দর্শনের পথিকৃৎ বলে প্রচারে নামলেন, তাঁরা কেউ-ই পথিকৃৎ নন। বরং তাঁরা যুক্তিবাদের দর্শন' চরিত্রটিকে ধরতেই পারনেনি। তাঁদের লেখায় এ'কথা বেরিয়ে আসেনি যে,

'যুক্তিবাদ' একটি স্ববিরোধিতাহীন বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি। যুক্তিবাদের সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যৌন্দর্যবোধ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, মূল্যবোধ, নারী-পুরুষের প্রণয় সম্পর্ক ইত্যাদি বাস্তব বিভিন্ন বিষয়।

কিছু সমাজ-সচেতন, রাজনীতি-সচেতন মানুষ মনে করেন, 'সমকালীন যুক্তিবাদী দর্শন' এবং তার স্রষ্টার উত্থান ঠেকাতেই রাষ্ট্র লড়াইতে নামিয়েছে তার সহযোগী শক্তিদের। বার বার একই মিথ্যা প্রচার করে মিথ্যাকেই 'সত্যি' বানাতে চাইছে। এই মিথ্যে

পাশ্চাত্যের (Rationalism & New Rationalism) যুক্তিবাদ ও নব্য-যুক্তিবাদ

পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদের চর্চার একটা ইতিহাস আছে। লক, কান্ট, হিউম প্রমুখ চিন্তাবিদরা যুক্তিবাদ বা Rationalism তত্ত্বের প্রতিষ্টা করেছিলেন।

এই যুক্তিবাদের মূল বক্তব্য ছিল—জ্ঞান মাত্রেই reason বা যুক্তি-বুদ্ধি থেকে আসে। ইন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে আমরা যা জানতে পারি, বুঝতে পারি, তাতে ভুল থাকতে পারে। কারণ ইন্দ্রিয় প্রতারিত হতে পারে। ফলে আমরা ইন্দ্রিয় থেকে যা পাই, তাকে 'জ্ঞান' না বলে 'মতামত' বলাটাই ঠিক হবে।

প্রাচীন এই যুক্তিবাদীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করতেন, মানুষ কিছু সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মায়। এই সহজাত ধারণাগুলো কখনই মিথ্যে হতে পারে না। সম্ভবত ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির সময় এই ধারণাগুলো মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেন।

এইসব যুক্তিবাদীরা যুক্তিকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু কালবদ্ধতার কারণে, অর্থাৎ সেই সময়কার সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মায় বিশ্বাস ইত্যাদি কিছু বিশ্বাসের উর্ধ্বে তাঁরা উঠতে পারেননি। আমরা বলতে পারি, তাঁরা হলেন 'ঈশ্বরবাদী যুক্তবাদী'। অর্থাৎ বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের মতোই তাঁরাও আগেই ঈশ্বর আছেন, ধরে নিতেন।

পশ্চিমি দেশগুলোতে 'New Rationalism' বা 'নব্য যুক্তিবাদ' বলে একটি মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে। এই 'নব্য যুক্তিবাদ অন্যান্য দেশেও ইতিমধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে।

নব্য যুক্তিবাদের মতে 'মন' হল প্রকৃতির-ই উৎপন্ন ফল (product), প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে ওঠে। প্রকৃতি যেহেতু তার নিজস্ব নিয়মে চলে, তেমনই মানুষের মনও প্রকৃতিগত যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। সোজা কথায়—মন যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রকৃতির বিশালতার অংশমাত্র আমাদের মন ধরতে পারে। যে'টুকু ধরতে পারে, তাকে যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে গ্রহণ করলে ভুল হওয়া উচিত নয়। আমাদের গাণিতিক (Mathematical) ও তর্কশাস্ত্র বিষয়ক (logical) আলোচনা থেকে সেসব সত্য উঠে

আসে তা জগতের বস্তুগত নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত। এর সঙ্গে অপার্থিব কোনও কিছুর সম্পর্ক নেই।

আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় থেকে আসে না। আসে অভিজ্ঞতা থেকে। এই অভিজ্ঞতা নিজের হতে পারে আর পূর্বসূরিদের থেকে পাওয়া—এমনও হতে পারে।

এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না। ইন্দ্রিয়গুলো না থাকলে আমরা নিজের বা পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতাম কী করে? আর পূর্বসূরিরা-ই বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মাথায় রাখতেন কীভাবে? মাথায় আসে না!

ইন্দ্রিয় আমাদের যেমন মাঝে-মধ্যে ভুল দেখায়, ভুল শোনায়, ভুল বোঝায়, তেমন-ই ঠিক-ঠাক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের অবদানকে কোনও অবস্থাতেই অস্বীকার করতে পারি না। ইন্দ্রিয় যে মাঝে-মধ্যে ভুল বোঝায় এবং এই ভুল বোঝার পিছনেও যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে—তা আমরা বুঝতে পারি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই।

নব্য যুক্তিবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জেমস হার্ভে রবিনসন (James Harvey Robinson)-এর মতে, 'নব্য যুক্তিবাদ' মনে করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা সৃজনশীল চিন্তার (creative thought)।

অনেকেই যুক্তির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ পাননি—তাই যুক্তিহীন। আবার যুক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেই যে সবাই যুক্তিবাদী হয়ে উঠবেন এমনটা নয়। কারণ যুক্তিবাদী হয়ে উঠতে গেলেযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী হওয়াও। দু'য়ের মেলবন্ধনে একজন যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে।

এত কিছুর পরও 'নব্য যুক্তিবাদ' শেষ পর্যন্ত একটা মতবাদ হয়ে রইল। বিশ্বের সমস্ত কিছুকে দেখার ও বিশ্লেষণ করার দর্শন হয়ে উঠল না।